ইউনিট ২
মাছের স্বাস্থ্য

ইউনিট ২ মাছের স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য বলতে দেহ ও মনের সুস্থতা বুঝায়। যখন কোন প্রাণী স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও নির্দিষ্ট সময়ান্তে বংশবৃদ্ধির যোগ্যতা অর্জন করে, অর্থাৎ যৌন পরিপক্কতা লাভ করে তখন তাকে স্বাস্থ্যবান বলা হয়। স্বাস্থ্যবান প্রাণী পরিবেশের অন্যান্য প্রাণী-উদ্ভিদের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করে। মাছের সুস্থতার জন্য পরিমিত সুষম খাদ্য এবং জলজ পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণের মাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা বা নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মাছের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, সুস্থ মাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, রোগাক্রান্ত মাছের সাধারণ লক্ষণ, লক্ষণ দেখে মাছের বিভিন্ন রোগ নিরূপণের পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন এবং রোগাক্রান্ত মাছকে শণাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি:

- মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছের স্বাস্থ্য মাছ চাষে কিরূপ প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাছ চাষে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য মাছের রোগ কীভাবে হুমকি হয়ে দেখা দেয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষির বিভিন্ন উৎপাদনশীল শাখায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাষ পদ্ধতি রয়েছে। এসব চাষ পদ্ধতির মধ্যে চাষের ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের গঠন ও প্রকৃতি, উৎপাদন উপকরণ, চাষযোগ্য ফসল ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় মাছ চাষ কার্যক্রম অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। জলজ বাস্তুসংস্থান পরিবেশের বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদ ও জড়বস্তু সমন্বয়ে গঠিত। তাই জলজ বাস্তুসংস্থান জটিল এবং অপেক্ষাকৃত অস্থিতিশীল। জলজ বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এরূপ অবস্থায় জলজ পরিবেশ মাছের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে এবং মাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। ফলে মাছের বৃদ্ধিহার কমে যায়, মাছ রোগাক্রান্ত হয় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। তাই সফলভাবে মাছ চাষের লক্ষ্যে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

জলজ বাস্তুসংস্থান জটিল এবং অপেক্ষাকৃত অস্থিতিশীল। জলজ বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এরূপ অবস্থায় জলজ পরিবেশ মাছের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে এবং মাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। ফলে মাছের বৃদ্ধিহার কমে যায়।

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো-

- স্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ বজায় রাখা
- সুষ্ঠুভাবে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা
- উৎপাদন উপকরণের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- প্রতি একক ক্ষেত্র থেকে অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা
- ভাল জাতের পোনা উৎপাদনের জন্য মান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করা
- জলজ পরিবেশের লাগসই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই মৎস্য উৎপাদন বজায় রাখা।

অধিক উৎপাদনের প্রধান শর্ত স্বাস্থ্যবান মাছ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন রোগজীবাণু, পরজীবী এবং জলজ পরিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের কাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর মাত্রা সম্পর্কে জানা যায়। মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবী নির্মূল করা যায় এবং রোগ বিস্তারকারী পরিবেশগত নিয়ামকের মাত্রা সংশোধন করে রোগের প্রকোপ কমানো

যায়। অর্থাৎ যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে মাছের রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ অথবা আধানিবিড় বা নিবিড় মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের মজুত ঘনত্ব বেশি থাকে।

সাধরণভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে গৌণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এরূপ পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক পোনা মাছ ছাড়া হয় এবং অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ অথবা আধানিবিড় বা নিবিড় মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের মজুত ঘনত্ব বেশি থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ফলে এরূপ চাষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের রোগ সংক্রমণের আশংকা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। অনেক রোগ মাছে ব্যাপক হারে মড়ক ঘটায়, মাছের উৎপাদন কমায় এবং মাছ চাষকে ঝুকিপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু মাছের স্বাস্থ্যগত অবস্থান এবং পরিবেশের অবস্থা জানা থাকলে যথাসময়ে পরিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের মাত্রা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত এবং রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মাছের স্বাস্থ্যগত অবস্থা জানা থাকলে রোগ সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধ করা যায় এবং যথাযথ রোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সংক্রমিত বা রোগাক্রান্ত মাছের মৃত্যুহার কমানো যায়। যদি ব্যবস্থাপনা ত্রুটির জন্য মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটে বা মাছ রোগাক্রান্ত হয়, তবে এরূপক্ষেত্রে যথাযথ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

মাছের স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রোগের ধরন ও উৎস, অর্থাৎ মাছ কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু কোন্‌টি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এবং কার্যকরভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন বাইরের কোন উৎস যথা- সংক্রমিত রেণু, পোনা বা ডিমওয়ালা মাছ রোগ সংক্রমণের কারণ হলে নির্বীজকরণ (disinfection) এবং সংগনিরোধ (quarantine) ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজেই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অপুষ্টিজনিত রোগে মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং এতে মাছ সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

অনেক সময় অপুষ্টিজনিত কারণে মাছের বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। অপুষ্টিজনিত রোগে মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং এতে মাছ সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মাছের স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত লক্ষণ দেখে খাদ্যে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে তা জানা যায়। সম্পূরক খাদ্যের সাথে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে পুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং অধিক উৎপাদনের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। মাছ আমাদের পুষ্টির প্রধান উৎস। প্রাণিজ আমিষের সিংহভাগই আসে মাছ থেকে। মাছ চাষের ক্ষেত্র বদ্ধ জলাশয় মশার বংশবৃদ্ধির জন্য উত্তম প্রজনন ক্ষেত্র। মশা মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বাহক (Carrier) এবং পোষক (host)। মানুষের দেহ থেকে রক্ত শোষণের সময় স্ত্রী এনেফিলিশ মশা ম্যালেরিয়ার রোগজীবাণু মানুষের দেহে সংক্রমিত করে। ফলে মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে পুকুরের পানি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করা হয়। এতে করে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগ, যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়। এছাড়াও মাছের রোগ সৃষ্টিকারী অনেক রোগজীবাণু তাদের জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্য মানুষের দেহে মাধ্যমিক পর্যায় অতিবাহিত করে এবং

রোগের সংক্রমণ ঘটায়। যেমন- ফিতাকৃমি *(Diphyllobothrium latum)*, কৃমি *(Clonorchis sinensis)* মাধ্যমিক পোষক (intermediate host) হিসেবে মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। জলজ পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে লাভজনকভাবে মাছের উৎপাদনের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের এসব হুমকি দূর করা যায়।

অনুশীলন (Activity): মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থানার উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

সারমর্ম: মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ বজায় রাখা এবং মাছের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আক্রান্ত মাছের রোগের উৎস ও রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করা যায় এবং টেকসই উৎপাদন বজায় রাখা যায়। অস্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণুর পোষকের উত্তম প্রজনন স্থল। দূষিত পানি মানুষের দেহে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ সৃষ্টি করে। মাছের রোগ সৃষ্টিকারী অনেক রোগজীবাণু মানুষের দেহে জীবনচক্রের মাধ্যমিক পর্যায় অতিবাহিত করে ও রোগের সংক্রমণ ঘটায়। তাই জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণেও মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক) মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য কী?
- i) মাছে রোগ সৃষ্টি করা
- ii) মাছের মজুত ঘনত্ব কমানো
- iii) মাছের টেকসই উৎপাদন বজায় রাখা
- iv) পুকুরে সার ও খাদ্য সরবরাহ করা

খ) নিচে লিখিত কোন্ পরজীবী মাধ্যমিক পোষক হিসেবে অবস্থান করে মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে?
- i) *ইকথায়োপথিরিয়াস মালটিফিলিস*
- ii) *ডাইফাইলোবোথ্রিয়াস লেটাম*
- iii) *অরগুলাস ফলিয়াসেস*
- iv) *ড্যাকটাইলোগাইরাস*

২। **সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।**

ক) মশা মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বাহক এবং পোষক

খ) অধিক উৎপাদনের প্রধান শর্ত স্বাস্থ্যবান মাছ।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) সফলভাবে মাছ চাষের লক্ষ্যে মাছের ---------- অপরিহার্য।

খ) জলজ বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন ---------- গুণাগুণের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

পাঠ ২.২ সুস্থ ও রোগাক্রান্ত মাছের সাধারণ লক্ষণসমূহ

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুস্থ মাছের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণ উল্লেখ করতে পারবেন।

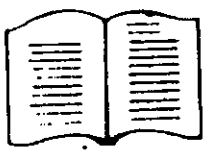

মাছের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের অসঙ্গতি বা বিকৃতি এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা বা জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

জীব জগতের সকল প্রাণী-উদ্ভিদ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মাছও এর ব্যতিক্রম নয়। মাছের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের অসঙ্গতি বা বিকৃতি এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা বা জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সুস্থতা এবং রোগ এই দুটি বিষয়ের একটি অপরটির আপেক্ষিক। সুস্থ মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ রোগাক্রান্ত মাছের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি রোগাক্রান্ত মাছ চিনতে হলে প্রথমে একটি সুস্থ মাছের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হবে।

*সুস্থ মাছের সাধারণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

- মাছের বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক থাকবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে মাছ কাঙ্ক্ষিত আকার ও ওজন অর্জন করবে।
- বিভিন্ন অঙ্গের আকারগত অনুপাত ঠিক থাকবে। যেমন- দেহের তুলনায় মাথা মানানসই দেখাবে, লম্বার তুলনায় প্রশস্ততা যথাযথ থাকবে।
- ত্বকের বা আঁইশ-এ স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকবে।
- মাছ স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করবে।
- মাছ স্বাভাবিক আচরণ দেখাবে।
- পানির উপর ভেসে থাকবে না বা পাড়ের কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না।
- ভয় দেখালে দ্রুত পানির নিচে চলে যাবে।
- দেহের কোন অংশে ঘা, ক্ষত বা রক্তক্ষরণ থাকবে না।
- পাখনা দুমড়ানো থাকবে না, বা পাখনা ও ফুলকায় পচন দেখা যাবে না।
- দেহের কোথাও কোন পরজীবী থাকবে না।

একটি রোগাক্রান্ত মাছে বিভিন্ন ধরনের অসংগতিপূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. আচরণগত অসংগতি (behavioural signs)

২. শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত বা শারীরবৃত্তীয় লক্ষণ (clinical symptoms)

আচরণগত অসংগতি

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কার্যকারণ ভিন্ন ভিন্ন। তাই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মাছ বিভিন্ন রকম আচরণগত অসঙ্গতি প্রকাশ করে থাকে। কোন রোগাক্রান্ত মাছে নিচে লিখিত অসংগতিগুলোর কোন একটি বা একাধিক অসংগতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে-

- মাছ সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।
- মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়।
- মাছ শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।
- পানির উপর অলসভাবে ভেসে থাকে।
- দ্রুত গতিতে ও অস্থিরভাবে সাঁতার কাটে।
- মাছ পুকুরে অবস্থিত শক্ত কিছুতে গা ঘসতে থাকে।

- মাছ পানি নির্গমনের স্থানে জড়ো হয়।

শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ

রোগাক্রান্ত মাছে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর কোন একটি বা একাধিক লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পেতে পারে-

- দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখায়।
- মাছের দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত (mucus) হয়।
- প্রয়োজনীয় মিউকাসের অভাবে মাছের দেহ খস্‌খসে হয়।
- মাছের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য থাকে না।
- মাছের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়, বর্ণ ফ্যাকাশে বা গাঢ় হয়।
- আঁইশ, ত্বক বা পাখনায় ক্ষত বা ঘা দেখা দেয়।
- ফুলকায় ক্ষত বা পচন দেখা দেয়।
- আঁইশ ফুলে ওঠে বা খসে পড়ে।
- ফুলকার বর্ণ পরিবর্তিত হয়, বর্ণ ফ্যাকাশে বা রক্তাভ হয়।
- আঁইশের গোড়া, ত্বক, পায়ুপথ বা ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়।
- মাছের পেট ফুলে ওঠে।
- পায়ুপথ বা ফুলকায় প্রদাহ হয়।
- মাছের চোখ বের হয়ে আসে।
- মাছের দেহে সুক্ষ্ম সুতার মত বস্তু দেখা দেয়।
- মাছের ত্বক বা পাখনায় বিন্দুর মত সাদা দাগ দেখা দেয়।
- মাছের দেহে বা ফুলকায় ডোরারমত দাগ দেখা দেয়।
- মাছের দেহে, পাখনায় বা ফুলকায় পরজীবী বা সিস্ট পরিলক্ষিত হয়।
- মাছের শরীরে ঘা বা লালচে বিন্দুর মত ক্ষত দেখা দেয়। দেহের কোন অংশ বাদামী বা ধূসর হয়ে যায়।
- মাছের দেহগহ্বরে ঘোলাটে, সাদা বা পরিষ্কার তরল জমা হয়।
- হঠাৎ ব্যাপক হারে মাছের মড়ক দেখা দেয়।

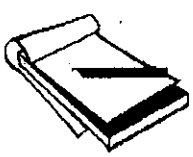

অনুশীলন (Activity): রোগাক্রান্ত মাছের আচরণগত অসংগতিসমূহ কী কী?

সারমর্মঃ অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যর অসঙ্গতি বা বিকৃতির মধ্যে দিয়ে মাছের রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণগুলো শণাক্ত করার জন্য সুস্থ মাছের আচরণগত ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত থাকতে হবে। রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- আচরণগত অসংগতি এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ। সুস্থ মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ থাকে এবং স্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করে। রোগাক্রান্ত মাছে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি দেখা দেয় এবং অস্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক) সুস্থ মাছের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
- i) দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখায়
- ii) মাছের বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক থাকে
- iii) মাছ পানির উপর অলসভাবে ভেসে থাকে
- iv) মাছের পেট ফুলে ওঠে

খ) নিচে লিখিত কোন্‌টি রোগাক্রান্ত মাছের আচরণগত অসংগতি?
- i) দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখায়
- ii) ভয় দেখালে দ্রুত পানির নিচে চলে যায়
- iii) ফুলকায় ক্ষত বা পচন দেখা দেয়
- iv) মাছ দ্রুত গতিতে ও অস্থিরভাবে সাঁতার কাটে

২। সত্য হলে "স" এবং মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।

ক) আঁইশ, ত্বক বা পাখনায় ক্ষত বা ঘা দেখা দেওয়া রোগাক্রান্ত মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ।

খ) রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) সুস্থ মাছের পাখনা দুমড়ানো ---------- ।

খ) রোগাক্রান্ত মাছের ---------- বের হয়ে আসে।

পাঠ ২.৩ লক্ষণ দেখে মাছের রোগ নির্ণয়

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণ পর্যবেক্ষণে অনুসরণীয় পদক্ষেপগুলোর উল্লেখ করতে পারবেন।
- লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়ে স্বাভাবিক আচরণ ও সুস্থ অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

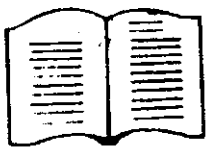

বিভিন্ন রোগের কিছু সাধারণ লক্ষণ থাকলেও প্রতিটি রোগের কিছু বিশেষ ধরনের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ রয়েছে। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় রোগ প্রতিকারের জন্য অপরিহার্য পূবশর্ত।

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মাছ বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে। এসব লক্ষণ মাছের রোগ নির্ণয়ে দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন রোগের কিছু সাধারণ লক্ষণ থাকলেও প্রতিটি রোগের কিছু বিশেষ ধরনের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ রয়েছে। এসব লক্ষণ দেখে মাছের রোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করা যায়। অর্থাৎ মাছ কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় রোগ প্রতিকারের জন্য অপরিহার্য পূবশর্ত। তাই রোগ নির্ণয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত। নিচে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে লক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যদি দেখা যায় যে পূর্ব পাঠে বর্ণিত রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণের অনুরূপ কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তবে বুঝা যাবে যে মাছ রোগাক্রান্ত হয়েছে।

লক্ষণ দেখে মাছের রোগ নির্ণয়ে অনুসরণীয় পদক্ষেপ

- মাছের বৃদ্ধি কি কাঙ্ক্ষিত? অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তে মাছ প্রত্যাশিত আকার ও ওজন অর্জন করেছে কি-না?
- মাছের বিভিন্ন অংঙ্গের আকারগত অনুপাত কি স্বাভাবিক? যথা- মাথার তুলনায় দেহ স্বাভাবিক কি-না? দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখাচ্ছে কিনা?
- মাছের কোন অঙ্গ যেমন- লেজ, পাখনা, আঁইশ, ফুলকা, ইত্যাদিতে কোন বিকৃতি বা অসঙ্গতি দেখা যায় কিনা?
- মাছের দেহে কোন ঘা, ক্ষত, পচন দেখা দিয়েছে কিনা? দেখা দিলে তার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ? কোন একটি বিশেষ অঙ্গে কি ঘা বা ক্ষত দেখা দিয়েছে?
- মাছ কি স্বাভাবিক আচরণ করছে? মাছের অস্বাভাবিক আচরণ, যেমন-দ্রুত সাঁতার কাটা ও চলাচলের ধরন, একাকী থাকছে না অন্যান্য মাছের সাথে অবস্থান করছে, শক্ত কোন কিছুতে গা ঘসছে কিনা, মাছ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে কিনা এসব আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে মাছের প্রবণতা কিরূপ, বিশেষ করে সকাল বেলা দেয়া সম্পূরক খাদ্য পুরোপুরি গ্রহণ করছে কিনা? মাছ কি স্বাভাবিক মাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করছে, নাকি খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা মন্থরতা প্রদর্শন করছে?
- মানুষের উপস্থিতিতে মাছ কিরূপ আচরণ করছে, দ্রুত পানির নিচে চলে যায়, না অলসভাবে চলাফেরা করে?
- মাছের বর্ণ কি স্বাভাবিক? মাছ কি স্বাভাবিক বর্ণের চেয়ে কালচে বর্ণ ধারণ করেছে? মাছের স্বাভাবিক বর্ণ কি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে?
- মাছে কি মড়ক দেখা দিয়েছে? দিয়ে থাকলে কোন প্রজাতির মাছ মারা যাচ্ছে? নাকি সব প্রজাতির মাছই মারা যাচ্ছে? মাছের মড়কের হার কি পরিমাণ?

উল্লিখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়ে মাছের স্বাভাবিক আচরণ, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং এরূপ অবস্থায় মাছের বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন। মাছের স্বাভাবিক আচরণ ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা থাকলে মাছের আচরণগত বা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন বা বিচ্যুতির তুলনা করে মাছের রোগ নির্ণয় করা যায়। মাছের

স্বাভাবিক আচরণ এবং দৈহিক সুস্থাবস্থা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত না থাকলে রোগ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

অনুশীলন (Activity): আপনার এলাকায় স্থানীয় বাজার থেকে একটি রোগাক্রান্ত মাছ ক্রয় করুন এবং লক্ষণগুলো দেখে রোগ নির্ণয় করুন।

সারমর্ম : রোগাক্রান্ত মাছে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। রোগ-ব্যাধির কিছু সাধারণ লক্ষণ থাকে এবং সেই সাথে বিভিন্ন রোগের জন্য সুনির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণও থাকে। এসব বিশেষ লক্ষণ দেখে মাছের বিভিন্ন রোগ শণাক্তকরণ করা যায়। রোগ প্রতিকারের প্রধান শর্ত সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়। লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়ে মাছের আচরণ, স্বাস্থগত অবস্থা এবং বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি বা বিকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক) লক্ষণ দেখে মাছের রোগ নির্ণয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করা হয়?
- i) মাছের আচরণ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি।
- ii) পুকুরের পানির বর্ণ
- iii) পুকুরের পানির গভীরতা
- iv) পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগের সময় ও পরিমাণ

খ) মাছের রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব কী?
- i) রোগ নির্ণয় একটি গৌণ বিষয়
- ii) রোগ নির্ণয় করলে উৎপাদন কমে যায়
- iii) রোগ নির্ণয়ের সাথে উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই
- iv) রোগ নির্ণয় রোগ প্রতিকারের পূর্বশর্ত

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক) মাছের সবরোগেই একই লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

খ) মাছের আরচণ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় রোগ ---------- জন্য অপরিহার্য -------।

খ) রোগ-ব্যধির কিছু ---------- লক্ষণ থাকে।

পাঠ ২.৪ রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বলতে পারবেন
- রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছের রোগ প্রতিরোধে করণীয় পদক্ষেপগুলোর উল্লেখ করতে পারবেন।

'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়' এই ভিত্তিতেই মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি রোগ প্রতিরোধ। মাছে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। পানিতে বসবাস করে বিধায় মাছের বিভিন্ন কার্যাবলী ও আচরণ পর্যবেক্ষণ কষ্টসাধ্য। এ কারণে নির্ভুলভাবে মাছের রোগ নিরূপণ করা এবং রোগ সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিকতর কষ্টসাধ্য।

আবার অনেক রোগই মাছকে খাদ্য প্রদানের পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। একারণে মুখে ওষুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ততটা কার্যকরী হয় না। অন্যদিকে রোগাক্রান্ত মাছকে জীবাণুমুক্ত (disinfect) করার জন্য কোন দ্রবণে ডুবানো বা গোসল করানোর পদ্ধতি বড় খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব হয় না। এসব বিবেচনায় সুষ্ঠুভাবে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম।

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং সফলভাবে রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণঃ

১. জলজ পরিবেশের গুণাবলী যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ
২. দুষণ নিয়ন্ত্রণ
৩. জলাশয়ের স্থান নির্বাচন
৪. সুষ্ঠু মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা
৫. নিয়মিত মনিটরিং এবং
৬. জলজ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

নিচে মাছের রোগ প্রতিরোধের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ (controlling water quality)

জলজ পরিবেশের বিভিন্ন গুণাবলী, যেমন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, পি.এইচ, তাপমাত্রা, অ্যামোনিয়া, মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি মাছের জীবনযাত্রায় নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা রাখে। এসব গুণাবলী কাঙ্ক্ষিত মাত্রার না হলে মাছ পরিবেশগত পীড়নের শিকার হয় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। পানির বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর মাত্রা অনুকূল সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে মাছকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। পানির বিভিন্ন গুণাবলীর অনুকূল মাত্রায় মাছ সুষম হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মাছের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

> পানির বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর মাত্রা অনুকূল সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে মাছকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

মজুত ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য প্রয়োগ (rearing managemet & feeding)

মাছের রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পুকুরে ভাল পরিবেশ বজায় রাখতে হয়। সঠিক সংখ্যায় পোনামাছ মজুতকরণ, নমুনায়নের সময় যত্নের সাথে মাছ নাড়া-চাড়া করা এবং সতর্কতার সাথে পরিবহন মাছের রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অধিক উৎপাদনের জন্য পোনা মজুতের পর পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণে মাছের পূর্ণ পুষ্টিসাধন হয় না। পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনের লক্ষ্যে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। সুষম খাদ্য গ্রহণে মাছ সুস্থ-সবল থাকে এবং এতে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এন্টিবায়োটিকযুক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ করা যায়। অতিরিক্ত খাদ্য বা সার প্রয়োগে

পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাছে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং সঠিক সংখ্যায় পোনা মজুত, পরিমিত সার প্রয়োগ ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করে মাছের বিভিন্ন রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

পুকুর জীবাণুমুক্তকরণ (pond disinfection)

পুকুর জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে মাঘ-ফাল্গুন মাসে পুকুর শুকিয়ে ফেলে তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এরপর তলায় চাষ দিয়ে রোদে কয়েকদিন শুকাতে হবে। সূর্যালোক সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবাণুমুক্তকারক।

পুকুর শুকনো এবং পুকুরে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর জীবাণুমুক্ত করে সফলভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। পুকুর জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে মাঘ-ফাল্গুন মাসে পুকুর শুকিয়ে ফেলে তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এরপর তলায় চাষ দিয়ে রোদে কয়েকদিন শুকাতে হবে। সূর্যালোক সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবাণুমুক্তকারক পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে তলার মাটি জীবাণুমুক্ত হয়। অতঃপর উক্ত পুকুরে যথানিয়মে মাছ চাষ করা হলে সাধারণত কোন রোগ-বালাই দেখা দেয় না। চুন প্রয়োগের মাত্রা মাটির পি.এইচ-এর ওপর ভিত্তি করে কম-বেশি হতে পারে।

মজুদ পুকুরে পোনামাছ ছাড়ায় ৪-৫ দিন পূর্বে নার্সারি বা চারা পোনার পুকুরে ০.২৫ পিপিএম হারে ম্যালথিয়ন প্রয়োগ করে চাষকৃত মাছের পরজীবীঘটিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও পোনা মজুদের সময় পুকুর প্রস্তুতকালে একবার এবং কার্তিক মাসে একবার প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে মাছের জীবাণুঘটিত (pathogenic) প্রায় সব রোগই প্রতিরোধ করা যায়। আরগুলাসজাতীয় পরজীবীর সংক্রমণ দেখা দিলে পুকুরে ০.৫ পিপিএম হারে ডিপটারেক্স সপ্তাহান্তে ২বার প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ (disinfection of appliances)

মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- পোনা পরিবহন পাত্র, হাপা, খাদ্য প্রদানের পাত্র, জাল বা মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম রোগজীবাণু ও পরজীবীর বাহক হিসেবে কাজ করে।

মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- পোনা পরিবহন পাত্র, হাপা, খাদ্য প্রদানের পাত্র, জাল বা মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম রোগজীবাণু ও পরজীবীর বাহক হিসেবে কাজ করে। এসব উপকরণ এক জলাশয় হতে অন্য জলাশয়ে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেগুলো ভালভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ৪০-৫০ পিপিএম মাত্রার ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে এসব উপকরণ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। অতঃপর শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথকভাবে লালন পালন (separation of year-class fish populations)

অনেক সময় প্রজননক্ষম এবং বয়স্ক মাছ অনেক রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু এসব মাছ রোগাক্রান্ত হয় না। পূর্বে মাছ ঐসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে দেহে উক্ত রোগের স্বাভাবিক প্রতিরোধক ব্যবস্থা (immune system) গড়ে ওঠে। ফলে মাছ উক্ত রোগজীবাণুর উত্তরজীবী (survivor)-তে পরিণত হয়। কিন্তু ঐসব রোগ জীবাণু অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মাছ বা ভিন্ন বয়সগ্রুপের মাছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বয়স গ্রুপের মাছকে আলাদা ভাবে পালন করে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

মরা বা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষ মাছ অপসারণ (removal of dead / moribund fish)

এক পোষক হতে অন্য পোষকে গমন বা স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগজীবাণুর সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। রোগাক্রান্ত মরা মাছে বা মুমূর্ষ মাছে রোগজীবাণু দ্রুত বংশ বিস্তার করে। তাই মরা ও মুমূর্ষু মাছ পুকুর থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব অপসারণ করে রোগ সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করা যায়।

রাসায়নিক প্রতিরোধ (chemoprophylaxis)

মাছকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য খাইয়ে, রাসায়নিক দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে রেখে বা পুকুরে প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য নির্দিষ্ট রোগজীবাণু মেরে ফেলে বা পানির গুণাবলীর উন্নয়ন করে রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রোগ এবং রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মাছের রোগ প্রতিরোধে প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২-৩% হারে সাধারণ লবণ দ্রবণ ব্যবহার করে অল্প ব্যয়ে এবং সহজেই বিভিন্ন ধরনের পরজীবী ও অণুজীব সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। মাঝে মাঝে ২-৩ পিপিএম হারে পটশিয়াম পারম্যাংগানেট প্রয়োগ করে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো যায় এবং এতে মাছের রোগ প্রতিরোধ হয়। নমুনায়ন বা অন্য কোন কারণে ধরা মাছ ৫০০-১০০০ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দ্রবণে কয়েক সেকেন্ড ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়া হলে মাছের সাধারণ রোগ-বালাই প্রতিরোধ হয়।

শারীরবৃত্তীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি (immunization)

কৃত্রিমভাবে শারীরিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করে মাছের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। যে সব রোগে ব্যাপকহারে মাছের মড়ক দেখা দেয় সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধ করা হয়। শারীরবৃত্তীয় প্রতিরোধক কয়েকটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা যায়। যথা-

১. নিমজ্জনের (immersion) মাধ্যমে
২. দ্রবণের ধারা দিয়ে (spary shower)
৩. ভ্যাকসিন দিয়ে (vaccination)

সাধারণত ছোট পোনা মাছ (১-৪ গ্রাম) এবং রেণু নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে নিমজ্জনের মাধ্যমে অনেক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। আঙ্গুলে পোনা (fingerling) দ্রবণের ধারা দিয়ে ইমুনাইজেশন করা হয়। ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে কার্পজাতীয় মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত কলামনারিস রোগ, রক্তক্ষরণ সেপটিসেমিয়া (haemorrhagic septicaemia) এবং ভাইরাসজনিত রোগ স্প্রিং ভাইরেমিয়া অব কার্প (SVC) সহজেই সফলভাবে প্রতিরোধ করা যায়। প্রজননে ব্যবহৃত পরিপক্ক মাছে ভ্যাকসিন দিয়ে অনেক সংক্রামক রোগ খুবই সহজে প্রতিরোধ করা যায়। এতে পোনার শরীরে নির্দিষ্ট রোগের প্রতিরোধক সৃষ্টি হয় ও রোগ প্রতিরোধ হয়।

সংগনিরোধ (quarantine)

দূরবর্তী কোন স্থান হতে বিশেষ করে ভিন্ন কোন দেশ হতে নতুন প্রজাতির কোন মাছ আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাছকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগনিরোধ ব্যবস্থায় রাখতে হবে। এতে উক্ত মাছে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তা চাষের পুকুরে ছাড়া উচিত হবে না।

ভৌগলিক অবস্থান এবং জলাবায়ুগত ভিন্নতার কারণে কোন স্থানের সাধারণ রোগ অন্যস্থানে মহামারী হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাই দুরবর্তী ভিন্ন কোন জলাশয় বা ভিন্ন কোন দেশ হতে কোন মৎস্য প্রজাতি চাষের জন্য আনা হলে তা সরাসরি কোন পুকুর বা জলাশয়ে অন্য কোন মাছের সাথে ছাড়া উচিত নয়। আমদানীকৃত নতুন মাছ কোন সংক্রামক রোগের বাহক হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে চাষকৃত মাছে ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। তাই দূরবর্তী কোন স্থান হতে বিশেষ করে ভিন্ন কোন দেশ হতে নতুন প্রজাতির কোন মাছ আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাছকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগনিরোধ ব্যবস্থায় রাখতে হবে। এতে উক্ত মাছে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তা চাষের পুকুরে ছাড়া উচিত হবে না। সংগনিরোধ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট মাছ কোন রোগে আক্রান্ত কিনা বা কোন রোগ জীবাণুর বাহক কিনা তা জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে সংগনিরোধ ব্যবস্থা মাছের রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

মাছের রোগ প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

১। দূরবর্তী স্থানের বা ভিন্ন দেশের কোন মাছ মজুদ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংক্রমণ রোধ করার লক্ষ্যে উক্ত মাছকে সংগনিরোধ ব্যবস্থায় রাখতে হবে।

২। হ্যাচারিতে পানি সরবরাহের সময় পানির সাথে যাতে কোন মাছ বা জলজ প্রাণী না আসে সেদিকে নজর দিতে হবে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে সংক্রামক রোগজীবাণু ব্রুডমাছ, রেণু বা পোনা মাছে সংক্রামিত হতে পারে; যা পরবর্তীতে কোন অঞ্চলের মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

৩। মাছ চাষের বিভিন্ন উপকরণ দুটি ভিন্ন খামারে ব্যবহারের মধ্যবর্তী সময়ে ২০০ পিপিএম ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

৪। পুরাতন পুকুর প্রতি ৩ বছরে ন্যূনতম ১বার শুকিয়ে ফেলতে হবে এবং তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

৫। পুকুরের মাছ, বিশেষ করে পোনা মাছ ও কৈশোর অবস্থায় মাছের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে; লক্ষ্য করতে হবে মাছে কোন রোগ দেখা দিয়েছে কিনা, কোন পরজীবী দেখা যায় কিনা?

৬। মাছের মজুদ ঘনত্ব সঠিক সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ ও মিশ্রচাষে আনুপাতিক হার বজায় রাখতে হবে।

৭। পানির গুণাগুণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮। মাছকে পরিমিত পরিমাণে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৯। পরিবেশগত পীড়ন দূর করতে হবে। নমুনায়ন বা অন্যকোন কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্তকতা ও যত্নের সাথে মাছ নাড়া-চাড়া করতে হবে।

১০। রোগ জীবাণু ও পরজীবীমুক্ত মাছ প্রজননের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জীবনচক্রের কোন্ অবস্থায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মাছ পরবর্তীতে পরোপুরি সুস্থ হলেও তা প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

অনুশীলন (Activity): সংগনিরোধ কী এবং কেন করা হয়?

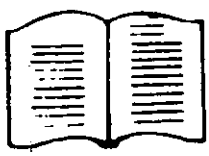

সারমর্ম ঃ মাছ পানিতে বসবাস করে। এজন্য তার বিভিন্ন কার্যাবলী, শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ কষ্টসাধ্য। এ প্রেক্ষিতে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই উত্তম। মাছের রোগ প্রতিরোধের চাবিকাঠি হলো সুষ্ঠুভাবে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা। পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, সঠিক সংখ্যায় মজুত ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ, পরিমিত খাদ্য সরবরাহ, পুকুর জীবাণুমুক্তকরণ, উৎপাদন উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ, বিভিন্ন বয়স গ্রুপের মাছ আলাদাভাবে পালন এবং রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু বা মরা মাচ দ্রুত অপসারণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যকরভাবে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া ও রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগ বা খাওয়ানোর মাধ্যমে এবং ইমুনাইজেশন প্রক্রিয়ায় শারীরবৃত্তীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করে মাছের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। দূরবর্তী ভিন্ন কোন স্থান বা অন্য কোন্ দেশ হতে মাছের নতুন প্রজাতি আমদানীর ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় সংগনিরোধ ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক) মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি কী?
- i) রোগ প্রতিকার
- ii) রোগ প্রতিরোধ
- iii) ভ্যাকসিনেশন
- iv) মিশ্র চাষ

খ) মাছ চাষের উপকরণ জীবাণুমুক্ত করার জন্য কত পিপিএম মাত্রার ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়?
- i) ১০০-৫০০ পিপিএম
- ii) ৭০-৮০ পিপিএম
- iii) ৪০-৫০ পিপিএম
- iv) ০.২৫-০.৫ পিপিএম

২। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।
ক) সুষম খাদ্য গ্রহণে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
খ) অনেক রোগাক্রান্ত মাছ পরবর্তীতে ইতিপূর্বে আক্রান্ত রোগের বাহকে পরিণত হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।
ক) প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ----------।
খ) পরিপক্ব মাছে ---------- দিয়ে অনেক ---------- রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।
ক) রেণু পোনার ইমুনাইজেশন করা হয় কোন্ পদ্ধতিতে?
খ) মাছ কোন্ রোগে আক্রান্ত কি-না তা কীভাবে নিরূপণ করা হয়?

পাঠ ২.৫ বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণ

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন নিয়ামকের কারণে রোগ সংক্রমণের তীব্রতার মাত্রা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্ত করতে পারবেন।

অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পিছনে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকারণ নিয়ামক রয়েছে। এসব নিয়ামকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন রকম লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে। এসব কার্যকারণ নিয়ামক এবং লক্ষণকে বিবেচনায় রেখে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়া, রোগের মাত্রা ইত্যাদি নির্ণয়ের কতকগুলো পদ্ধতি আছে। যথা-

১. পুকুর পর্যবেক্ষণ
২. আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং
৩. মাছের দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

পুকুর পর্যবেক্ষণ

পুকুর পর্যবেক্ষণকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. পানির গুণাবলী পরীক্ষা
খ. মাছের মৃত্যুর প্রকৃতি যাচাই
গ. পুকুরের ইতিহাস পর্যালোচনা
ঘ. উৎপাদন উপকরণ যাচাই করা

পানির গুণাবলী পরীক্ষা ঃ পুকুরে পানির বিভিন্ন গুণাবলী, যেমন- দ্রবীভূত অক্সিজেন, পি.এইচ, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি চাষকৃত মাছের উপযোগী মাত্রায় আছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। পানির বিভিন্ন গুণাবলীর মাত্রা খুববেশি গরমিল হলে মাছ কোন রোগে আক্রান্ত না হয়েও অল্প সময়ের মধ্যে মারা যেতে পারে।

সাধারণত পরিবেশগত পীড়নে এবং ভাইরাসজনিত রোগে মাছের রোগের সংক্রমণের তীব্রতা ও মৃত্যুর হার বেশি হয়। অপুষ্টিজনিত রোগে মাছের মৃত্যুহার সবচেয়ে কম হয়ে থাকে।

মাছের মৃত্যুর প্রকৃতি ঃ পরিবেশগত পীড়ন এবং রোগজীবাণুর সংক্রমণে মাছ রোগাক্রান্ত হয়। বিভিন্ন রোগ জীবাণু এবং পরিবেশগত পীড়নের মাত্রার ওপর নির্ভর করে মাছের রোগের তীব্রতা এবং মৃত্যুর সংখ্যানুপাত কম-বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত পরিবেশগত পীড়নে এবং ভাইরাসজনিত রোগে মাছের রোগের সংক্রমণের তীব্রতা ও মৃত্যুর হার বেশি হয়। অপুষ্টিজনিত রোগে মাছের মৃত্যুহার সবচেয়ে কম হয়ে থাকে।

পুকুরের ইতিহাস ঃ কীভাবে পুকুর সৃষ্টি হয়েছে, পুকুরের বয়স কত, কি কারণে পুকুর কাটা হয়েছে, পুকুরে পানির স্থায়িত্বের প্রকৃতি অর্থাৎ পুকুরে সারা বছর পানি থাকে, না বছরের কয়েক মাস পানি থাকে, পুকুর শুকানো হয়েছিল কি-না ইত্যাদি বিষয় পুকুরের তলদেশ এবং পুকুরে বিদ্যমান প্রাণী ও অণুজীব সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা মাছের রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করে।

উৎপাদন উপকরণ ঃ পানি ও পোনার উৎস এবং সারও খাদ্যের উৎস, খাদ্য গুদামজাতকরণের অবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় মাছের রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

মরা মাছের চেয়ে জীবিত মাছ পর্যবেক্ষণ অধিকতর কার্যকরী ফল দেয়। আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগজীবাণু শনাক্তকরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

সাধারণত মাছের ত্বক, ফুলকা, অন্ত্র, চোখ ইত্যাদির আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। মরা মাছের চেয়ে জীবিত মাছ পর্যবেক্ষণ অধিকতর কার্যকরী ফল দেয়। আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগজীবাণু শনাক্তকরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। রোগাক্রান্ত মাছের নিম্নোক্ত অঙ্গ/স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করা হয়-

- ঘা, ক্ষত বা অস্বাভাবিক দাগ থেকে

- পাখনার গোড়ার মিউকাস থেকে
- ত্বক বা ফুলকার সিস্ট থেকে
- রক্ত থেকে
- অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ থেকে
- ত্বক বা ফুলকার টুকরা থেকে।

মাছের দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণে বা পরজীবীর আক্রমণে মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মাছ ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণ করার জন্য মাছের আচরণ এবং বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাহ্যিক লক্ষণ সাধারণত খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। নিম্নবর্ণিত বাহ্যিক লক্ষণগুলো দেখে একটি রোগাক্রান্ত মাছকে শনাক্ত করা যায়-

ক. মাছের ত্বকে অতিরিক্ত মিউকাস নিঃসৃত হওয়া
খ. মাছের এবড়োথেবড়ো চলাচল বা সাঁতার কাটা
গ. পাখনা ভাঁজ হওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া
ঘ. আঁইশ উঠে যাওয়া বা বহির্গত হওয়া
ঙ. ত্বকে ক্ষত, পচন বা ঘা হওয়া
চ. পেট ফুলে যাওয়া
ছ. ত্বকে, পাখনার গোড়ায় পরজীবীর উপস্থিতি
জ. মাছের রং ফ্যাকাশে হওয়া
ঝ. ত্বকে সাদা বা লালচে দাগ দেখা দেয়া
ঞ. ফুলকা ও পায়ু পথে প্রদাহ হওয়া।

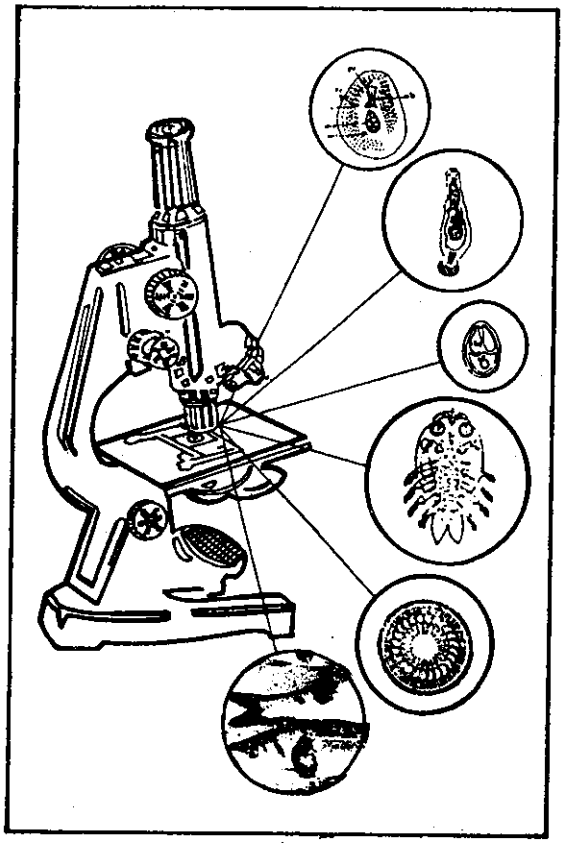

চিত্র ৭ : রোগ নির্ণয়ে আণুবিক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

চাষকৃত মাছে উল্লিখিত লক্ষণগুলোর কোন একটি বা একাধিক লক্ষণ যুগপৎভাবে পরিলক্ষিত হলে বুঝা যাবে যে মাছ রোগাক্রান্ত হয়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন রোগের সুনির্দিষ্ট লক্ষণের সাথে আক্রান্ত মাছের লক্ষণ মিলিয়ে নিয়ে মাছ কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

অনুশীলন (Activity) : বাজার থেকে কয়েকটি মাছ ক্রয় করে তাদের বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করুন।

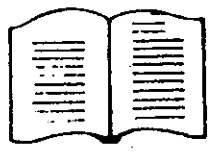

সারমর্ম ঃ রোগাক্রান্ত মাছে বিভিন্ন রকম লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে তাকে। এসব লক্ষণের কিছু বাহ্যিক এবং কিছু অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে প্রকাশিত হয়। পুকুর পর্যবেক্ষণ, মাছের দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং মাছের আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মাছ, রোগের কারণ এবং রোগ সংক্রমণের মাত্রা নিরূপণ করা যায়। পরিবেশগত পীড়ণে এবং ভাইরাসজনিত রোগে মাছের মৃত্যুহার বেশি হয়। অপুষ্টিজনিত রোগে মাছের মৃত্যুহার তুলনামূলক কম হয়। পানির বিভিন্ন গুণাবলীর মাত্রায় খুব বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে মাছ কোন রোগে আক্রান্ত না হয়েও অল্প সময়ে মারা যেতে পারে। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণে মাছের আচরণ এবং অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। যথা- ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, সাঁতারের ধরন, পাখনা-আঁইশের অবস্থা, দেহে পরজীবীর উপস্থিতি, দেহে ঘা-ক্ষত আছে কি-না ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক) নিচে লিখিত কোন ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত মাছে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি হয়?

i) ভাইরাসজনিত রোগে
ii) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে
iii) অপুষ্টিজনিত রোগে
iv) পরজীবীজনিত রোগে

খ) কোন্‌টি রোগাক্রান্ত মাছের বাহ্যিক লক্ষণ?

i) অন্ত্রে কৃমি হওয়া
ii) যকৃৎ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া
iii) ত্বকে ক্ষত, পঁচন বা ঘা হওয়া
iv) খাদ্যনালীতে রক্তক্ষরণ হওয়া

২। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।

ক) আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে রোগ জীবাণু শণাক্ত করা যায়।
খ) রোগাক্রান্ত মাছে কোন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) পরিবেশগত পীড়ণে মাছের ---------- বেশি হয়।
খ) বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শণাক্তকরণে মাছের ----------
এবং ---------- বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক) আক্রান্ত মাছের খাদ্য নালীতে রক্তক্ষরণ হওয়া কোন ধরনের লক্ষণ?
খ) আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য কী?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ২

১। মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। মাছের রোগের লক্ষণসমূহকে প্রধানত কত শ্রেণিতে ভাগ করা হয় ও কী কী?
৩। একটি সুস্থ মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণের তুলনা করুন।
৪। রোগাক্রান্ত মাছের আচরণগত অসংগতিগুলো কী কী?
৫। মাছের রোগাক্রান্ত অবস্থা শনাক্তকরণে সুস্থ মাছের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করুন।
৬। সংগনিরোধ কীভাবে মাছের রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে?
৭। মাছের রোগ নির্ণয়ে লক্ষণ পর্যবেক্ষণের পদক্ষেপগুলোর বর্ণনা করুন।
৮। মাছের রোগ প্রতিরোধে করণীয় পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৯। রোগ নির্ণয়ে পুকুর পর্যবেক্ষণের ধাপগুলো কী কী? আলোচনা করুন।
১০। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১১। রোগ নির্ণয়ে আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব কী?
১২। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ২

পাঠ ২.১
১। ক) iii খ) ii
২। ক) স খ) স
৩। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খ) ভৌত-রসায়নিক

পাঠ ২.২
১। ক) ii খ) iv
২। ক) স খ) মি
৩। থাকবেনা খ) চোখ

পাঠ ২.৩
১। ক) i খ) iv
২। ক) মি খ) স
৩। ক) প্রতিকারের পূর্বশর্ত খ) সাধারণ

পাঠ ২.৪
১। ক) ii খ) iii
২। ক) মি খ) স
৩। ক) শ্রেয় খ) ভ্যাকসিন, সংক্রামণ
৪। ক) নিমজ্জন পদ্ধতিতে খ) সংগনিরোধের দ্বারা

পাঠ ২.৫
১। ক) i খ) vi
২। ক) স খ) মি
৩। ক) মৃত্যুহার খ) আচরণ, বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক
৪। ক) অভ্যন্তরীণ খ) রোগজীবাণু শনাক্ত করা